

ধর্ম -কি এবং কেনো? : একটি মডেল (Model)

বিপ্লব পাল

কি যে ধর্ম আর কি যে অধর্ম, এই সঙ্গটাই আজকাল চুরান্ত বৃত্তান্তিকর। তাই আমি ধর্মের আদি অকৃত্রিম সঙ্গা –ধৃ+অন ট, মানে যা ধারণ করে তাই নিয়েই লেখা শুরু করলাম। এই বৃত্তের অর্থে, ধর্ম হচ্ছে সেই দর্শন এবং মানবিক ক্রিয়ার যোগফল যা মানুষের দৈহিক এবং মানসিক বিচরন স্থলকে একটি বৃত্তের মধ্যে ধরে রেখেছে। সেই সার্বজনীন অর্থে ইসলাম, হিন্দুধর্ম এবং কমুনিজম –সবই ধর্ম।

ঈশ্বরের ভূমিকা বিচারকের—ওপর থেকে দেখা, মানুষ সেই বৃত্তের মধ্যে আছে কিনা। ঈশ্বরের রোলটা কমুনিজমে একনায়কতান্ত্রিক সরকার হাইজ্যাক করে। আবার ইরানের মতো ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হলে তো পোয়াবারো—সরকার নিজেই অবতীর্ণ ঈশ্বরের দেওয়া দণ্ড পরলোকে না দিয়ে ইহলোকে দিতে!

ধর্মের উৎপত্তি নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন আদিম যুগে মানুষ প্রকৃতিকে ভয় পেতো বলে, ভগবানের কল্পনা শুরু হয়। উদাহরণ ঋকবেদ। মেসোপটেমিয়া, মহেজ্জদারোর প্রত্নতাত্ত্বিক নমুনা। কিন্তু এটি অতিসরলীকরণ। জন্তু জানোয়ারেরাও ভয় পায়। তাহলে তো ওদেরও ভগবান থাকার কথা? আপনি বলবেন আরে ওদের তো কল্পনা করার ক্ষমতা নেই— তাই কাল্পনিক ভগবান ও নেই। না সেটাও ঠিক নয়। কুকুরেরা আজকাল হামেশাই যোগ বিয়োগ করছে। পশু পাখির যথেষ্টই কল্পনা শক্তি আছে। পশু আর মানুষের সাথে কি এমন পার্থক্য যে মানুষ ভগবানের ভয় পেতে শুরু করল?

সঙ্গত কারণেই মানুষের সামাজিক বিবর্তনের কথা উঠছে। ধর্মের উৎপত্তি বুঝতে গেলে বানর সমাজ থেকে মনুষ্য সমাজের উত্তোরণ বোঝা দরকার। এই ইতিহাস সত্তর লক্ষ বছরের। আগে মনে করা হতো এই বিবর্তন ঘটেছে সরল রেখায়—অর্থাৎ শিবপাঞ্জী থেকে মানুষের বিবর্তনের মধ্যে অন্য কোনো স্পেসিস বা প্রজাতির জন্ম হয় নি। সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ায় বানর মানুষের ফসিলের আবিষ্কারে এই ধারণায় চির ধরেছে। এর পরে কেনিয়ায় দানব মানুষের ফসিল পাওয়ায়, বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত যে এই সত্তর লক্ষ বছরে আরো অনেক মানব প্রজাতির অস্তিত্ব ছিল—যারা যোগ্যতমর লড়াইয়ে পরাভূত হয়ে আজ অবলুপ্ত।

ভাবছেন ধান ভাঙতে বিবর্তনের গীত! আসলে আমাদের জানা দরকার কেন অবলুপ্ত হলো হোমোসেপিয়েন্সের এই প্রতিযোগীরা। এই ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান এখন স্পেকুলেশনের পর্যায়ে। ধর্মের উৎপত্তি জানতে হলে, এই অবলুপ্ত প্রজাতিদের সামাজিক বিন্যাস বিশ্লেষণ করতে হবে। দেখতে হবে, ঈশ্বর ভিত্তিক কল্পনা, কোন সামাজিক শক্তি তৈরী করে যার ভিত্তিতে আদিম যুগে তারা ঈশ্বরবিহীন সমাজকে পরাভূত করে, ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

ধর্ম ভিত্তিক সামাজিক বিবর্তনের চারটি চালিকা শক্তি!

প্রথম এবং মূল শক্তি, শিশু এবং নারীর সুরক্ষা—যাতে প্রজনন বৃদ্ধি পায়। প্রজনন বৃদ্ধির জন্যে দরকার —১) যুদ্ধে পুরুষের আত্ম বলিদান — তাদের নারীদের অন্য কেউ না হরণ করতে পারে বা শিশুদের কে হত্যা করতে না পারে। ২) নারীর উপর প্রজননের তীব্র চাপ ৩) চিকিৎসা ব্যবস্থা। শিশু মৃত্যুর হার অত্যাধিক বেশী থাকায়, আমি অতীতে মুক্ত-মনায় একবার হিসাব করে দেখিয়েছিলাম যে আদিম সমাজে নারী তার প্রজনন সক্ষম সময়ের ৭০% গর্ভ ধারণ না করলে

সেই সমাজের ঋণাত্মক বৃদ্ধি অনিবার্য ছিল। ধর্ম চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির পরিপন্থী হলেও, আদিমযুগে সামাজিক সুরক্ষা ছিলো আরো বড় প্রয়োজনীয়তা। বিজ্ঞানের উন্নতিতে সামাজিক সুরক্ষার প্রয়োজন আজ কমেছে। কিন্তু উন্নততর চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রয়োজন বাড়ছে। ধর্ম আজ তাই একটি ঋণাত্মক শক্তি।

দ্বিতীয় হচ্ছে সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বসমূহ। আদিম সমাজ তাই টোটোলাটারিয়ান বা স্বৈরতন্ত্রী। যাতে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলি সমাজ কে দুর্বল না করে। ধর্ম তাই প্রথম থেকেই শাসক শ্রেণীর সব চেয়ে বড় সহায়। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলিকে ভুলিয়ে রেখে সমাজকে একসূত্রে গাঁথতে ধর্মের জুরি মেলা ভার। আমেরিকান ইলেকশন থেকে ভারতে বিজেপির উত্থান—সর্বত্রই এক গল্প।

তৃতীয় হচ্ছে পুরুষ তান্ত্রিক জেনেটিক উত্তরাধিকার। স্তন্যপায়ীরা সাধারণত পুরুষতান্ত্রিক। সিংহ সমাজে দুই থেকে তিন জন পুরুষ—আর বাকীরা নারী। আদিম মনুষ্য সমাজের গঠন প্রায় একই রকম। পুরুষের এই আধিপত্য জিন বৈষম্যের স্বাভাবিক বিবর্তন। ব্যাপারটি একটু গভীরে বোঝা দরকার।

বিবর্তনের মূলে আছে জেনেটিক মিউটেশন। নারী পুরুষের ২৩তম জিনের মিলনে নতুন যে জেনেটিক কোড তৈরী হল, তার থেকে নতুন সন্তানের জন্ম—এই নতুন সন্তানের জেনেটিক কোড, তার পিতা মাতার থেকে যত আলাদা হবে, সন্তান সন্ততি র মধ্যে পার্থক্য তত বেশী হবে। এই পার্থক্যই বিবর্তনের চালিকা শক্তি। যদি দুই নারীর মিউটেশনে, সন্তান সন্ততি রা জন্ম নিতো, এই পার্থক্য হত নেহাতই অকিঞ্চিৎকর! তাই প্রকৃতির প্রয়োজন পুরুষের-যাদের জিন ক্রস ওভারের সময় আরো শক্তিশালী মিউটেশনের জন্ম দেবে! তাই নারীর দরকার শক্তিশালী পুরুষের। সিংহ, বানর সমাজ থেকে আদিম মানব সমাজে কিছু শক্তিশালী পুরুষটিকে থাকে—দুর্বলতরকে মেরে ফেলে শক্তিশালীরা। কায়ম করে একাধিক স্ত্রীর গর্ভ। এটা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই হয়। কিন্তু স্ত্রীর গর্ভে নিজের সন্তান এলো কি না, তা নিয়ে মাথা ব্যথা থাকে না। কারণ পশু এবং আদিম মনুষ্য সমাজে পুরুষ শিকারে ব্যস্ত—সমাজ তাই মাতৃতান্ত্রিক। মায়ের পরিচয় সন্তানের পরিচয়।

সমাজ কৃষিভিত্তিক হতেই সমস্যা শুরু হল। কৃষিকাজের প্রয়োজনে দুর্বল পুরুষকে মেরে ফেলার চেয়ে বাঁচানোর দরকার হলো বেশী। কিন্তু তারা বাঁচল ক্রীতদাস হিসাবে। 'সম্পত্তি'র জন্ম হল। পুরুষ সম্পত্তি বানায়। অতএব সে চাইল, তার নারী হোক সতি সাবিত্রি। যাতে একমাত্র তার সন্তানেরাই সম্পত্তি ভোগ করে। এতএব ধর্মের বিবর্তনে নারীর যৌন স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হল। সে হল পুরুষের ক্রীতদাসী। আর হল একাধারে পুরুষের যৌন এবং প্রজনন পুতুল। ঋকবেদ থেকে মনুসংহিতা—খ্রিস্ট পূর্ব ৩০০০ বছর আগের ঋকবেদ নারীকে যে স্বাধীনতা দিয়েছিল, তা সম্পূর্ণ করে নেওয়া হয়েছে ৬০০ খ্রিস্টাব্দের মনুসংহিতাতে এসে। মুক্ত-মনা, ভিন্নমত, বাংলার নারী ইত্যাদি ওয়েব সায়েটে আমি একাধিক নারীবাদী দেখেছি—যারা একাধারে ধার্মিক এবং নারীবাদী। তাদের ধারণা পুরুষেরা ধর্মকে হাইজ্যাক করেছে। দোষ ইসলামের নয়, দোষ পুরুষের! ব্যাপারটা খুব হাস্যকর—কারণ ধর্মের সৃষ্টিই হয়েছে পুরুষ তন্ত্রের চাহিদা মেটাতে!

এই তিনটি শক্তির কথা হেগেল তার দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদে দুশো বছর আগে লিখে গেছেন। কিন্তু লেখেন নি, ধর্মের সবচেয়ে আধুনিক শক্তির কথা।

চতুর্থ শক্তি 'মিথের' প্রয়োজন থেকে। মিথ থেকে জন্ম হয় ভাববাদের। যুক্তি এবং আবেগ এই দুই নিয়ে মানুষ তৈরী। ধরুন বাজারে গেলেন। ২০০ টাকা দরে ইলিশ বিকোচ্ছে। মাসের শেষ, হাতে নেই কড়ি! ইলিশের মরশুমও শেষ হয়েছে আসছে। সাত পাঁচ ভেবে মাছটি কিনলেন এবং

বাড়ীতে এসে গিম্মির বকা খেলেন। আবার আপনি নাও কিন তে পারেন। একটু ভেবে দেখলে দেখবেন, আপনার যাবতীয় সিদ্ধান্তের পেছনে থাকে - কিছুটা আবেগ, কিছুটা যুক্তি! মায়ের প্রতি সন্তানের ভালোবাসা—পূর্বরাগের আবিরে লাল— এসবে, যুক্তির চেয়ে আবেগ থাকে বেশী। আবার কেনাকাটা অথবা টাকা-পয়সার হিশেব করার সময় কিন্তু যুক্তি কাজ করে বেশী।

তাই বিরহ ব্যথার কোন ওষুধ নেই। প্রচুর টাকা হ লেই মানুষ সুখী হয় এমন নয়। মানুষ কামনা করে, ব্যর্থকাম হয়ে মনে আঘাত পায়। কামনা বল্লাহীন হলে আত্মহত্যাও করে। এই আবেগ কে স ত্যত ক রতে ধর্মে এসেছে ভাববাদ। বৌদ্ধ ধর্ম তৈরী হয়েছে, এই চতুর্থ শক্তি থেকে। বিবেকানন্দ ধর্মের নতুনরূপ দিয়েছেন এই ‘মিথে’ র উপর ভিত্তি ক রে। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সাথে সাথে, প্রথম তিনটি শক্তি পরাভূত হবে, কিন্তু, এই চতুর্থ শক্তিটি টিকে যাবে। মানুষ সম্পত্তি কামনায় ঈশ্বরের প্রার্থনা করে, ছেলের ভালো রেজালটের জন্য দোয়া করে—আবার মিশনারীরা সব কিছু ছেড়ে দিয়ে মানুষের সেবা করছে। বৈদিক ভাববাদ থেকে সুফীবাদ—অমর্ত্য সেনের ‘পছন্দের ত ত্ব’ থেকে মানুষের সৌন্দর্য্য চেতনা, ভয় পেয়ে সাপের পূজো, সব ই দাড়িয়ে আছে এই ‘মিথে’ র উপর। উপনিষদ এই মিথকেই বলছে মায়া।

অক্সফোর্ডের জীব বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিনস মনে করেন এই ‘মিথ’ আসলে আমাদের ডি এন এ র স্বার্থপরতা—নিজের কোড কে বাঁচানোর নানা ছলা কলা। ব্যাপারটা মেনে নেওয়া কঠিন। কারণ ডি.এন.এ কোড প্রোটিনের গঠন নির্ণয় করে শুধু — কিন্তু তা থেকে মানুষের মন কি ভাবে তৈরী হবে? ব্যাপারটা এখোনো ধোঁয়াশা। জৈব রসানিক প্রমাণ না দিতে পারলেও, জীব জগতের অনেক প্রমাণ ডঃ ডকিনস দিয়েছেন।

আপনি বলবেন চুলোয় যাক স্বার্থপর জিন—জিন ধুয়ে কি জল খাবো? তার চেয়ে আমার প্রিয়তমার ঠোঁটে একটা চুমু খাব!

যাই হোক অনেকেই বলেন ধর্মে এতো প্রেম, তাও এত হানাহানি! এই চারটি শক্তি পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে, প্রেম এবং ঘৃণা এই দুই মিলেই ধর্ম।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমি পৃথিবীর মূল ধর্ম গুলি এই চারটি শক্তির মডেলে আলোচনা করব।

[চলবে]